ঝর্ণা বসাক থেকে কিংবদন্তি নায়িকা শবনম...

মৌ সন্ধ্যা

ঝর্ণা বসাককে চেনেন? বাংলা ও উর্দু সিনেমায় অভিনয় করে কোটি মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন তিনি। বাংলা সিনেমার সোনালি সময় এসেছিল যাদের হাত ধরে তার মধ্যে অন্যতম একজন নায়িকা তিনি। ঝর্ণা বসাককে মনে করতে পারছেন না, নায়িকা শবনমকে চেনেন নিশ্চয়ই। নিজের অভিনয় গুণেই সবার কাছে মূল্যবান হয়েছেন তিনি। উর্দু ও বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তার নাম সোনার আখরে লেখা আছে। এই গুণী অভিনেত্রী জন্মেছিলেন আগস্ট মাসে। রঙবেরঙের পক্ষ থেকে তার প্রতি জন্মদিনের ফুলেল শুভেচ্ছা। তরুণ প্রজন্ম অনেকেই জানেন না তার জীবনের গল্প।

জন্ম ঢাকায়

ঢাকার মেয়ে শবনম। ১৯৪২ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকায় অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক জমিদার বংশে জন্ম নেন তিনি। তার পরিবারের কেউ চলচ্চিত্রের মানুষ ছিলেন না। তার বাবা ননী বসাক ছিলেন একজন ক্রীড়াবিদ এবং জনপ্রিয় ফুটবল রেফারি। এই পরিবারের কেউ সিনেমার নায়িকা হবেন সেটা ছিল অকল্পনীয়। ঝর্ণা ছোটবেলায় ছিলেন ভীষণ দুরন্ত, নাচের প্রতি ভীষণ টান ছিলো তার। মেয়ের শিল্পের প্রতি ঝোঁক তেমন পছন্দ করতেন না মা। তবে বাবার অনুপ্রেরণা ছিল সব সময়।

নাচের স্কুলে ভর্তি

ঝর্ণা বসাকের বাবা ননী বসাক গানবাজনা ভালোবাসতেন। তিনি চাইতেন তার মেয়েরাও সুরের সাধনা করুক। চমৎকার কণ্ঠ ছিল ঝর্ণার বড় বোনের। সেসময়ের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পীদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে, ঝর্ণা ছোট থেকেই নাচতে পছন্দ করতেন। যে কারণে নাচে তালিম নিতে শুরু করেন তিনি। নাচের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করে তার বাবা 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি'তে ভর্তি করান তাকে। পাশাপাশি পড়াশোনা চলতে থাকে স্থানীয় বাংলাবাজার স্কুলে। খুব অল্প সময়েই নৃত্যশিল্পী হিসেবে বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন ঝর্ণা। আর নৃত্যই তার ভাগ্য বদলে দেয়। নৃত্যের ক্লাস থেকে সরাসরি ডাক পড়ে সিনেমায়। নতুন স্বপ্নের হাতছানি উপেক্ষা করেননি বলেই আমরা পেলাম শবনমের মতো একজন নায়িকাকে।

সিনেমার পর্দায়

ঝর্ণার বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। হঠাৎ একদিন এক নৃত্যানুষ্ঠানে ঝর্ণার বাবার বন্ধু খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশাম তার নাচ দেখে মুগ্ধ হন। এরপর এই পরিচালক তার 'এ দেশ তোমার আমার' একটা গানের দৃশ্যে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। সেই সিনেমায় শুধু গানের দৃশ্যেই দেখা মেলে ঝর্ণার। এরপরে 'রাজধানীর বুকে' নামে আরেকটি সিনেমাতেও একটি গানের দৃশ্যে অভিনয় করেন। এখানে তার অভিনীত গানটি ছিল একজন বারাঙ্গনাকে নিয়ে। এই সিনেমা মুক্তির পরেই দর্শকদের নজর কাড়তে সক্ষম হন ঝর্ণা। ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় তার। এরপরই মুস্তাফিজ পরিচালিত 'হারানো দিন' সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের অফার আসে। ১৯৬১ সালে এই সিনেমা দিয়েই একক নায়িকা হিসেবে পথচলা শুরু হয় তার। সুপার হিট হয় 'হারানো দিন'। রাতারাতি খ্যাতি পেয়ে যান ঝর্ণা বসাক। এক সাক্ষাৎকারে শবনম বলেছিলেন, 'নাচের সঙ্গে অভিনয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাচেও যেমন শরীর

এবং মুখের এক্সপ্রেশন (অভিব্যক্তি) থাকে, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। কাজেই নৃত্যশিল্পী থেকে অভিনয়শিল্পীতে রূপান্তর হতে আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।'

বিয়ের পিঁড়িতে

১৯৫০-এর শেষের দিকে ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হয় তার ভাইয়ের বন্ধু রবিন ঘোষের, যিনি তখন ঢাকার 'রেডিও পাকিস্তান'-এ কর্মরত এবং সংগীত পরিচালক হিসেবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার চেষ্টা করছেন। দুই তরুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীর মধ্যে রোমান্টিক সম্পর্কে তৈরি হয়। ১৯৬৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঝর্ণা বসাক এবং রবিন ঘোষ বিয়ে করেন। এরপর শুরু হয় নতুন অধ্যায়। সিনেমার ক্যারিয়ার ভুলে মন দিয়ে সংসার করতে শুরু করেন ঝর্ণা বসাক। পরিবারকে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন তিনি। বিয়ের পর শবনম সিদ্ধান্ত নিলেন, আর সিনেমা করবেন না। এবার মন দিয়ে সংসার কাজ শুরু করবেন। সিনেমার ডাক আসতে থাকলে তিনি সোজা জানিয়ে দিলেন, তার পক্ষে আর সিনেমা করা সম্ভব না। কিছুতেই যখন নির্মাতারা শবনমকে ছাড়ছে না, তখন প্রায় নয় ভাইবোন পরিবেষ্টিত রবীন ঘোষের সংসারে শবনম নির্মাতাদের জানালেন, যদি তার শাশুড়ি এবং ভাশুর অনুমতি দেন, তাহলে আবার তার পক্ষে সিনেমা করা যেতে পারে। একটা সাংস্কৃতিক পরিবারে সিনেমায় ছেলের বউদের অভিনয় না করাটা অস্বাভাবিক। শাশুড়ির মত আগে থেকেই ছিল। পরিচালকরা যখন শবনমের ভাশুরের কাছে অনুমতি নিতে গেলেন, তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। জানালেন, ঝর্ণা অবশ্যই সিনেমা করবে। সিনেমা-সংসার দুটোই একসঙ্গে করা যায়। শবনমকে শুধু কিছু উপদেশ দিলেন, 'তুই অভিনয় কর। তবে এমন কোনো কাজ করবি না, যাতে পরিবারের বদনাম হয়। সিনেমাতে অশালীন কিছু করবি না তা হলেই হলো।'

ঝর্ণা বসাক হয়ে গেলেন 'শবনম'

পরিচালক এহতেশাম তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উর্দু চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত করেন ঝর্ণাকে। কিন্তু ঝর্ণা উর্দু বলতে পারতেন না। অভিনয়ের জন্যে তিনি উর্দু পড়তে এবং লিখতে শিখে নিলেন। এমনই একনিষ্ঠ অভিনয় শিল্পী ছিলেন তিনি। সেই সময়ের বিখ্যাত পরিচালক সুরুর বারাবাংভির (আসল নাম সাঈদ সাইদুর রহমান) ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে উর্দুতে কথোপকথন করতেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই উর্দু ভাষা রপ্ত করে নেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানে চলে যান ঝর্ণা। ললিউড (লাহোর কেন্দ্রিক পাকিস্তানি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি)-এ অভিষেকের জন্যই তিনি প্রথম 'শবনম' নামটি ব্যবহার করেন।

শবনম বলেন, আমি কিন্তু সিনেমার কাছে যাইনি, বরং সিনেমাই আমার কাছে এসেছিল। পরিচালক এহতেশামের হাত ধরেই আমার চলচ্চিত্রে প্রথম আগমন। ওনার পরিচালিত 'রাজধানীর বুকে' ছবিতে নাচের শিল্পী হিসেবে আমাকে দেখার পর, দর্শক এবং নির্মাতারা প্রচুর আগ্রহ দেখালেন নায়িকা হিসেবে দেখার জন্যে। তারপর পরিচালক

মুস্তাফিজ পরিচালিত 'হারানো দিন (১৯৬১)' দিয়ে আমার নায়িকা পর্বের উত্থান শুরু হলো। এরপর আর আমাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। পরপর অনেক ছবি (কখনো আসেনি, চান্দা, তালাশ, নাচঘর, কাজওয়ান, আখেরি স্টেশন) করলাম। চান্দা তো রীতিমতো সুপার হিট করল। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বাংলাসহ বিশেষ করে উর্দু ছবিতে আমার একচ্ছত্র অধিকার ছিল। প্রায় ২৩টা ছবি আমার ডায়মন্ড জুবিলি পেল। একজন বাঙালি নায়িকা হিসেবে সেই সময়ে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের জেবা, শামীম আরা, নিলোর মতো বাঘা বাঘা নায়িকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা খুব কঠিন কাজ ছিল। অভিনয়কে মন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম বলেই হয়তো সেই কঠিন কাজটা অতিক্রম করতে পেরেছিলাম এবং দর্শকরাও সে রকম আমাকে পছন্দ করেছিল।

সিনেমার নৃত্যপরিচালক

সিনেমার জন্য নিবেদিত ছিলেন শবনম। পরিচালকরা দরুণ ভরসা করতেন তার উপর। একবার এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক শরীফ নায়ার পরিচালিত 'দোস্তি (১৯৭১)' সিনেমার একটি গল্প শুনিয়েছিলেন শবনম। ওই সিনেমায় 'চিঠি যারা সাইয়া দেকা নাম লিখ দে, হাল মেরে আচ্ছা নেহি তামাম লিখ দে' গানের শুটিংয়ের সময় নাচের দৃশ্যে নৃত্যপরিচালক পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিচালক কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শবনম বললেন, তিনিই নাচের কম্পোজ করে দিতে পারবেন এবং দিলেনও। শবনমের নাচের কম্পোজিশনে খুশি হয়েছিলেন পরিচালক।

নাদিম-শবনম ও রহমান-শবনম

শবনম তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সিনেমায় অভিনয় করে নাদিমের সঙ্গে জুটি গড়েছিলেন। তাদের জুটি ছিলো ভীষণ জনপ্রিয়। তাদের অভিনীত সিনেমাগুলোর মধ্যে আছে আসরা, আনমল মোহাব্বত, আনাড়ি, আয়না, আজ এহসাস, কারাবান, খুবসুরত, জাঞ্জীর, তালাশ, পয়সে ও মেরে হামসফর। ১৯৬০ দশকের আরও একটি সফল জুটির রহমান-শবনম। রহমান ও শবনম জুটির বিখ্যাত সিনেমা 'রাজধানীর বুকে'। এই সিনেমার একটি জনপ্রিয় গান হচ্ছে, 'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো, চাঁদ বুঝি তাই জানে'। এরপর রহমান ও শবনম অনেক সিনেমা করেন। তাদের আরেকটি আলোচিত সিনেমার নাম 'দর্শন'।

পাকিস্তানে বসবাস

পেশার কারণে শবনম ১৯৬৮ সাল থেকে পাকিস্তানের করাচিতে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সত্তর দশকের শুরুতে শবনম ললিউডে (লাহোর) পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা হিসেবে নিজের স্থান পাকাপোক্ত করেন। তিনি নায়িকা হিসেবে পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পে ধ্বস নামার পূর্বে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

বাংলাদেশে ফেরা

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ১৯৯৭ সালে শবনম পাকিস্তান এবং সেখানকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে শবনম চলে আসেন বাংলাদেশে। ঢাকায় ফিরে দু'বছর বিরতি দেওয়ার পরে কাজী হায়াত পরিচালিত 'আম্মাজান' ছবিতে অভিনয় করেন। ছবিটি ১৯৯৯ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটি সুপারহিট হয় এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম সফল সিনেমা হিসেবে জায়গা করে নেয়।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পে অসামান্য অবদান রাখায় শবনম সম্মানসূচক পুরস্কার হিসেবে মোট ১২ বার নিগার পুরস্কার লাভ করেন। ২০১২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির অংশগ্রহণে শবনমের হাতে আজীবন কৃতিত্বের (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের লাক্স স্টাইল অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এখনও পাকিস্তানের মিডিয়া ও সাধারণ দর্শক মনে রেখেছেন তাকে। তাইতো সে দেশের 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' এ সর্বোচ্চ পদকটি পেলেন শবনম। ২০২৪ সালের ২৩ মার্চ এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় তার হাতে। বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে পাকিস্তান গিয়ে পুরস্কারটি নিয়ে আসেন তিনি।

প্রিয়জনকে হারোনো

২০১৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে গুলশানের নিজ বাসভবনে বার্ধ্যকজনিত কারণে মারা যান রবীন ঘোষ। তাদের সংসারে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে, নাম রনি ঘোষ। তার একমাত্র বড় বোন নন্দিতা দাস বর্তমানে ভারতের কলকাতার সিমলা রোডে বাস করছেন।

শেষকথা

শিল্পী হয়ে ওঠা অনেক কঠিন। প্রচুর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে শিল্পী হতে হয়। শবনমের মতো শিল্পী কালে কালে একজন আসেন। চিরদিন তিনি আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। ভালো থাকুক সকলের প্রিয় নায়িকা, ভালো কাটুক তার প্রতিটা দিন।